প্রত্নচিহ্ন-র পরবর্তী সংখ্যার জন্য লেখা পাঠান। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৬ জুন ২০২১। লেখা পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন 8942924234 এই নম্বরে। E-mail : ab.farque@gmail.com

অতীত খুঁড়ে ইতিহাস উদ্ধার

প্রত্নচিহ্ন

E-MAGAZINE

ব্যক্তিগত বিতরণের জন্য

দ্বিমাসিক ৪ পাতা ১ম বর্ষ - ৬ সংখ্যা ❑ ৩০ বৈশাখ, শুক্রবার, ১৪২৮ সন ❑ ১৪ মে, ২০২১

পৃথিবীর তিনটি রহস্যময় প্রত্নকীর্তি

অভিষেক ঘোষ



(গত সংখ্যার পর)

স্টোনহেঞ্জের গঠন বেশ জটিল। প্রাথমিক পর্যায়ে যখন এই স্তম্ভের নির্মাণ কাজ শুরু হয় তখন প্রথমে এর বাইরের অংশে গভীর করে খাল খনন করে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। তারপর এই বাঁধের ভেতরে বৃত্তাকার ভাবে পাথরগুলো স্থাপন করা হয়। প্রথমে ব্লু-স্টোনগুলো সাজানো হয় এবং এর প্রায় কয়েকশো বছর পরে সারসান নামক পাথরগুলো স্থাপন করা শুরু হয়। এই বৃদাকার পাথরগুলো খাড়াভাবে স্থাপন করা হয় এবং পাশাপাশি দুটো পাথরকে মুক্ত করতে আরেকটি পাথরকে আড়াআড়িভাবে স্থাপন করা হয় তার মাথার উপর দিয়ে। এভাবেই গড়ে উঠে স্টোনহেঞ্জের মূল স্তম্ভ। স্টোনহেঞ্জ বৃহদাকার একটি পবিত্র স্থানের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, যেখানে কাঠ এবং পাথরের তৈরি আরও অনেক কাঠামো এবং সমাধি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। সলিসবুরি প্লেইন নামক বিস্তীর্ণ ঢেউ খেলানো মূলত সবুজ অঞ্চলটি জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে আরো নানা বিস্ময়। এবং প্রায় দশ হাজার বছর পূর্ব থেকেই এই স্থান সেকালের মানুষজনের কাছে পবিত্র স্থান রূপে পরিচিত ছিল। স্টোনহেঞ্জ নির্মাণের বহু আগে থেকেই তাই ঐ অঞ্চলে বিভিন্ন উপাসনা এবং পূজা অর্চনা হয়ে আসছিলো, ঈশ্বরের কাছে কিছু চাইলে আগে উৎসর্গ বা কোরবানি (sacrifice)-র প্রথা প্রচলিত ছিল। আধুনিক ড্রুইডরা এখনো উত্তর অয়নান্ত দিবস বা কর্কট সংক্রান্তি উপলক্ষে মাথা ঢাকা সাদা পোষাক পরে স্টোনহেঞ্জে সমবেত হয় উপাসনার জন্য। বস্তুত সাহিত্য, পুরাণ, কিংবদন্তি থেকে শুরু করে শিল্পের নানা ক্ষেত্রে স্টোনহেঞ্জের রহস্যঘন উপস্থিতির প্রভাব প্রায়শই লক্ষিত হয়। নিঃসন্দেহে আরো অনেক অজানা তথ্য লুকিয়ে আছে ওই বিরাট পাথরগুলির শরীরে, যা হয়তো চিরকাল অজানাই থেকে যাবে।

২) **ইস্টার আইল্যান্ড ঃ** উইক-এন্ডে সোজা লং ড্রাইভে বেরিয়ে, রাজারহাটের ইকো পার্কস্থিত 'সেভেন ওয়াণ্ডার্স'-এ গিয়ে পৌঁছালে, দেখা যাবে গোমড়া-মুখো খান চল্লিশ মূর্তি পরপর সাজানো আছে। এরা আদতে 'মোয়াই'। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে, দক্ষিণ আমেরিকার চিলি থেকে ২,২০০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত 'ইস্টার আইল্যাণ্ড' হলো এই 'মোয়াই' বা প্রস্তর মূর্তিদের ঘর। আজ বিশ্বজুড়ে যে কারণে উক্ত দ্বীপটি তুমুল কৌতুহল উদ্রেক করছে, তার এক ও একমাত্র কারণ এই মোয়াই, কালে নিয়মে যা বিলুপ্তির দিন গুনছে। বস্তুত গোটা দ্বীপটি বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়েছে এবং এখানকার স্বাভাবিক আবহাওয়া অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। পর্যটন শিল্পের দরুণ জনসংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বীপটিতে। ২০১৭-র আদমশুমারি অনুযায়ী এখানকার মোট জনসংখ্যা ৭,৭৫০। যার মধ্যে প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ আজো নিজেদের 'রাপা নুই' অর্থাৎ দ্বীপটির প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে মনে করে। আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দে

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

'রাঙানটে' — একটি আদিম "যাদু বিশ্বাস"

ড. সুপম মুখার্জী

বিভাগীয় প্রধান ইতিহাস বিভাগ, এস.সি.বি.সি. কলেজ, লালবাগ

(গত সংখ্যার পর)

এরপর শুরু হয় বর্বর দশার তিনটি স্তর যেখানে মাটির পাত্র থেকে হরফ আবিষ্কারের মধ্যেই স্তরগুলি সীমায়িত। নিউমেক্সিকান ও পেরুর আদিবাসীদের দেখা যায় বর্বর দশার মধ্যস্তরে এবং বর্বর দশার সর্বোচ্চ স্তরে বা প্রাক সভ্যতার বা 'Pre-Civilisation' স্তরে হোমারের সময়ের গ্রীক ও সীজার এর সময়কার জার্মানিদেরকে মর্গান নির্দিষ্ট করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে পুরাতাত্ত্বিক বস্তুতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কথা বলা হয়ে থাকে সেখানেও ঐ আদিবাসীরাও কিন্তু জীবন ধারনের ক্ষেত্রে এখনও নিজ নিজ স্তরে অবস্থান করছে এবং age of food gathering man থেকে age of food producing man -এর ক্ষেত্রেও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আটকে রয়েছে। অর্থাৎ পুরাপ্রস্তর; মধ্যপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগে ঠিক যে যে অবস্থা ছিল এই আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ঠিক ঐ ভাবেই স্তর ভিত্তিক জীবন-যাপন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়।

যাইহোক আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যেতে পারে। এই যাদু বিশ্বাস, যা ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিশ্বাসের চেয়ে আলাদা ভারতে আর্য-অনার্য মিশ্র সংস্কৃতিতে যদি অথর্ব বেদের জন্ম হয়ে থাকে ধরা হয়। তাহলে ভারতের অনার্য সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্বই শুধু প্রমাণিত হয় না, সেই সাথে প্রাচীন মানব সমাজের শাশ্বত এই বিশ্বাসও প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন দেখা যাক যাদু বা ম্যাজিক (Magic) আসলে কি ধরনের হতে পারে। এটি মূলত দু-ধরনের (i) Contegious Magic, (ii) Imitative Magic। 'কনটেজিয়াস ম্যাজিকে' শত্রুপক্ষের কারো মৃত্যু চাইলে তার চুল, নখ বা কাপড়ের অংশ পুড়িয়ে সেই শত্রুর নিধনের মানসিক তৃপ্তি লাভ করা হয়। ধরা হয় এভাবেই শত্রু নিধন হয়ে যাবে। এটি তেমন প্রচলিত বিষয় নয়, মুষ্টিমেয় 'গুনিন' সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সমগ্র সমাজে যে ম্যাজিকের প্রভাব এ সময়ে বদ্ধমূল ছিল তাহল 'ইমিটেটিভ ম্যাজিক'। যেখানে যে কোন কিছুর নকল করেই কাঙ্খিত বস্তু লাভের চেষ্টা করা হত। অর্থাৎ এই ম্যাজিকের মূল কথা হল অনুকরণ। মানুষ যা ঘটাবে প্রকৃতিও তা নকল করবে, বা উল্টো করে বলা যায় যে প্রকৃতিতে যা ঘটে তার নকল করলেই তা ঘটবে।

এখন এই নকল করবার বিশ্বাস শুধু যে বাংলার মেয়েদের 'রাঙানটের' মধ্যে বেঁচে রয়েছে তাই নয় --- মেক্সিকোতেও কোজগর লক্ষ্মীপূজোতে মেয়েরা এলোকেশী থাকে কারণ তাতে নাকি খোলা চুলের মতো গোছাগোছা ফসল বা শস্য ফলবে। আবার পলিনেসিয়ার 'মাওরি' আদিবাসীরা আলুচারাকে বাঁচিয়ে রাখতে জমিতে এক ধরনের নাচগান করে। নাচের অঙ্গভঙ্গি হাওয়া আর বৃষ্টির নকল তোলার চেষ্টার বিষয়কেই তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি আজোও বিভিন্ন পূজানুষ্ঠানে যে আলপনা আঁকা হয় তা ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, তার মধ্যেও একটা কামনার প্রতিমূর্ত্তি রয়েছে। লক্ষ্মীপুজোয় লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ এঁকে তাকে ঘরে আনবার নকল করা হয়। আমেরিকার আদিবাসীরা বৃষ্টির জন্য গাছের ডালে মাটির হাড়িকে ফুটো করে তাতে জল রেখে বৃষ্টির নকল করে। প্রাচীন গুহাচিত্রগুলিতেও একই কামনা স্থান পেয়েছিল।

জেন হ্যারিসন দেখিয়েছেন যে, আদিবাসীরা শিকার বা যুদ্ধ শেষে নাচেনা। তারা বরং শিকার বা যুদ্ধের পূর্বেই তা করে। যুদ্ধে বা শিকারে যাবার পূর্বে যুদ্ধে বা শিকারে সাফল্যের নাচ — যা তাদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক; এরও জন্ম যাদু বিশ্বাস থেকেই। ভারতীয় মানবগোষ্ঠী যে এই

এরপর ২ পৃষ্ঠায় ▶

সম্পাদকীয়

প্রতি বছর ১৮ই এপ্রিল সারা বিশ্বে জুড়ে বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস পালন করা হয়। সারা বিশ্বের সমস্ত ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মৃতিসৌধ স্মারকগুলিকে রক্ষা করার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এদিন বিশেষ কিছু সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রাচীণ স্মৃতিসৌধ ও ভবনগুলি বিশ্বজুড়ে আমাদের কাছে এক একটি সম্পদ। আর এগুলোকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য। ভারতে মোট ৩৮টি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে। মোট ঐতিহ্যবাহী স্থানের সংখ্যার ভিত্তিতে ভারত বিশ্বে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। ভারতে হেরিটেজ সাইটের বিচারে মহারাষ্ট্র প্রথম স্থানে রয়েছে। মোট স্থান ৫টি। এরপরে রয়েছে রাজস্থান। ঐতিহ্য হচ্ছে এমন কিছু যা যুগ যুগ ধরে কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে টিকে রয়েছে। এটা হতে পারে কোন অভ্যাস আচার অনুষ্ঠান প্রথা বা এমন কোন স্থাপনা যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। আর তাই আমাদের প্রত্যেকের আবশ্যিক কর্তব্য আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক নির্দশনগুলোকে বাঁচানো। তবে বর্তমান সময় করোনা মহামারীর কারণে মানুষ আজ ঘরবন্দী। বহু মানুষকে আমরা গত এক বছরে হারিয়েছি কোভিডের কারণে। মহামারীর কারণে এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য মানুষের প্রাণ বাঁচানো। আমরা আশা রাখি একদিন ঝড় থেমে যাবে, সব আবার পুরনো ছন্দে চলবে আর দেশ-বিদেশের সুরম্য ঐতিহাসিক স্থানগুলি আবার মানুষের ভীড়ে ভরে উঠবে। আমরা স্বাস্থ্য সচেতনতার সাথে সাথে সেদিন ইতিহাস সচেতনও হব।

রেশম কথা

নিত্যগোপাল মণ্ডল

(গত সংখ্যার পর)



চীন থেকে ভারতবর্ষ এবং সেখান থেকে আন্তর্জাতিক দেশগুলিতে রেশমের বাণিজ্য বিস্তৃতি লাভ করে যে পথ দিয়ে সেই পথের হদিশ আমরা পাই চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং এর বিবরণ ও কোয়াতানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত চীনা রাজদূত চাও-কি-এনের প্রতিবেদন এবং পেরিপ্লাস গ্রন্থ থেকে। এইসব বিবরণ থেকে জানা যায় উত্তরবঙ্গ থেকে কামরূপের ভিতর দিয়ে চীন ও তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। পুন্ড্যবর্ধন থেকে কামরূপ এবং কামরূপ থেকে সমতট পর্যন্ত দুটি বাণিজ্য পথ ছিল যার মধ্যে দিয়ে কামরূপ ও সুবর্ণ কোডাকের সমৃদ্ধ ও সুচারু রেশম বস্ত্র অগরু, চন্দন, হাতি প্রভৃতি গৌড়বঙ্গে আমদানী করা হত। এখান থেকে আবার দক্ষিণবঙ্গের সামুদ্রিক বন্দরের মাধ্যমে ঐ সকল আমদানীকৃত পণ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়ত। এছাড়াও জানা যায় উত্তর ব্রহ্ম ও মণিপুরের ভিতর দিয়ে কামরূপ হয়ে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুদীর্ঘ ছিল এই পথ দিয়েই বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পরিব্রাজকরা এবং তিব্বতী দূতেরা মগধ, ব্রহ্মদেশ ও পুন্ড্রবর্ধন হয়ে তিব্বতে যাতায়াত করত, এছাড়াও মনে করা যায় যে, তিব্বতের সঙ্গে গৌড়বঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং অঞ্চল থেকে সিকিম, ভুটান পার হয়ে পর্বত সঙ্কুল গিরিপথের মধ্যে দিয়ে তিব্বত হয়ে চীন দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বঙ্গদেশ থেকে পূর্বাভিমুখী আরও একটি স্থলপথের কথা জানতে পারি তা হল পূর্ববাংলার ত্রিপুরা জেলার লালামায়-মায়নামতী অবতল থেকে মধ্য বহ্মদেশের 'পাগন' পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিউয়েন-সাং এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে একসময় পুন্ড্র ও বরেন্দ্রভূমির সঙ্গে রাঢ় ভূমি মুর্শিদাবাদ বীরভূম ও বর্ধমানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

তবে রেশম শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতি দেখা যায় মোঘল আমলে। মোঘল রাজা বাদশাহ, আমীর ওমরাহ ও অভিজাতদের অনুকূল্যে শিল্পটি আরও উৎকর্ষতা অর্জন করে। ষোড়শ শতাব্দীতে রেশম সুতো রপ্তানী ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা মূলত তাদের হাত ধরেই রেশম বস্ত্র বিশ্বের দরবারে তার আপন মহিমায় পৌঁছে যায়। ১৭৫৭ খ্রীঃ পূর্বাতন পুণ্ড্রেবর্দ্ধন রাজ্য (বর্তমানে মালদহ) থেকে তিনটি রেশমপূর্ণ জাহাজ রাশিয়ার দিকে পাড়ি দিয়েছিল। শুধুমাত্র রেশম বস্ত্রই নয়, রেশমরঞ্জন শিল্পের জন্য মালদহ জেলার খ্যাতি ছিল।

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▸

ভারতের কঙ্কাল দ্বীপ

অর্ঘ্য দীপ দাস ও সোমেশ মাইতি



ভারতের প্রায় উত্তর প্রান্তে একটা অন্যতম রাজ্য হল হিমাচল প্রদেশ। ওই হিমাচল প্রদেশের অন্যতম পর্যটন অঞ্চল হল সিমলা মানালি। মানালি থেকে প্রায় ৩২৭ কিমি দূরে একটা লেক আছে। যাকে রূপকুণ্ড লেক বলা হয়। সেখানেই এই কঙ্কালের উপস্থিতি। রূপকুণ্ড লেখ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০২০ মিটার ওপরে। চারদিকে পাথুরে জমি আর বরফে আবৃত পাহাড় দ্বারা ঘেরা। অত্যধিক বরফ থাকার কারণে এই রূপকুণ্ড লেকে পড়ে থাকা কঙ্কালদের অস্তিত্ব সবসময় পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র গরমকালে বরফ কিছুটা গলে গেলে এই কঙ্কালদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

এই রূপকুণ্ড লেকের কঙ্কাল এর অস্তিত্ব প্রথম পায় ১৯৪২ সালে হরি কিষাণ মাধওয়াল। তিনি ছিলেন নন্দা দেবী জঙ্গলের একজন ফরেস্ট অফিসার। তার সাথে ছিল আরো কয়েকজন ব্রিটিশ অফিসাররা। প্রথম দিকে ব্রিটিশরা মনে করেছিল এই কঙ্কালগুলো জাপানিদের, যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশদের হাতে পরাজিত হয়ে ভারত হয়ে পালিয়ে গেছিলো। হয়তো ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে তারা মারা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে গবেষণা করে তা অবশ্য নাকচ করে দেয়া হয়।

প্রায় ২০০ মতো কঙ্কালের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। প্রথমদিকে মনে করা হয়েছিল কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ওখানকার অধিবাসীরা মারা যায়। ওখানকার শুকনো বরফাকৃত পরিবেশের জন্য কঙ্কালগুলো প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত হয়ে যায়। প্রকৃতির এমন খেয়াল এদের শরীরের হারগুলো তো নষ্ট হয়নি, এদের চামড়া পর্যন্ত পচে যায়নি। শুধু তাই নয় শরীরে জামাকাপড়ের অস্তিত্ব পর্যন্ত পাওয়া গেছে। *(ক্রমশ)*

▸ ১ পৃষ্ঠার পর

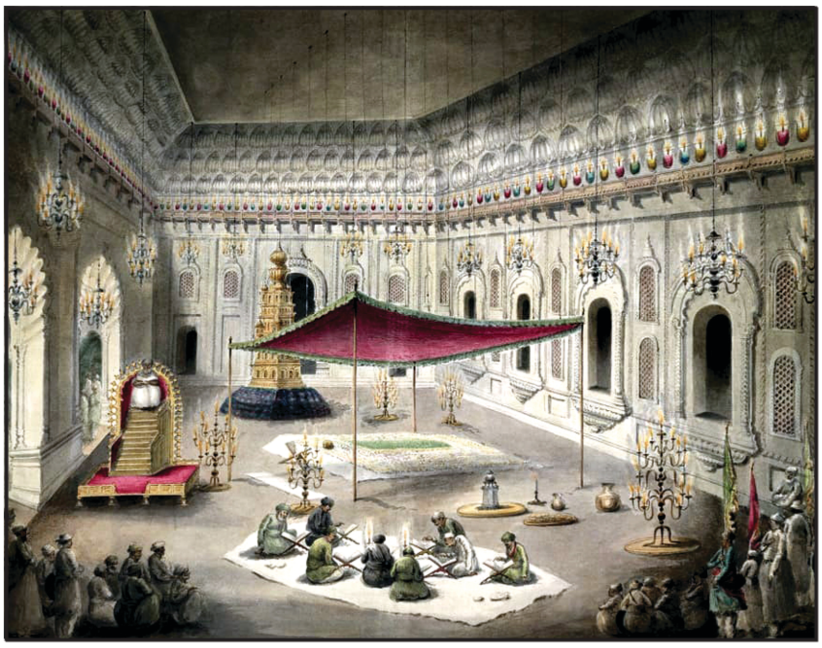
'রাঙানটে' — একটি আদিম "যাদু বিশ্বাস"

যাদু বিদ্যাগত ধারার মধ্য দিয়ে এসেছিল তার বহু প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন সাহিত্যে। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের 'বকডালভ্য' গল্প বা বারংবার ব্যবহৃত 'কামগান' কথাটি যার দ্বারা কামনা সফল হবার জন্য গানের কথা বলা হয়েছে।

বর্তমানে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, উন্নত মানব সমাজে আরো উন্নততর হচ্ছে, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান চেতনা মানুষকে উদার ও বাস্তববাদী করে তুলেছে। ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে পুরানো যাদুবিদ্যা সম্পর্কিত আচার অনুষ্ঠান। কিন্তু সভ্যতা বিবর্তনের ধারবাহিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এ সমস্ত আচরণ এক একটি পর্যায়কে চিহ্নিত করে রেখেছে। প্রত্যেক দেশের আদিম সমাজেই মানুষ ও প্রকৃতির কর্মকাণ্ডের মিল সৃষ্টি করেছিল এ জাতীয় যাদু বিশ্বাস। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ প্রকৃতিকে যতই নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে, ততটাই নষ্ট হয়েছে প্রকৃতির ভারসাম্য। বর্ধিত চাহিদা মেটানোর তাগিদে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে তার ক্ষতি করার পাশাপাশি নিজের সঙ্গে প্রকৃতির দূরত্বকেও বাড়িয়ে দিল। আর তাই আজ পৃথিবী ধ্বংসের চিন্তায় মানুষ উদ্বিগ্ন। চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে শুরু করে কৃষি বিজ্ঞান সহ প্রতিটি অপরিহার্য ক্ষেত্রে তাই মানুষ পুনরায় প্রকৃতি মুখী হতে চাইছে। যাইহোক, এই 'রাঙানটের' মতো অনুষ্ঠানগুলি এক সাম্প্রদায়িকতাহীন বিশেষ সমাজকে উপস্থাপনও করতো সে কথাও মনে রাখা জরুরী। *(শেষ)*

আসফ-উদ-দৌলা : অওধের এক খেয়ালী নবাব

ফারুক আব্দুল্লাহ



১৭৬৪ সালের বক্সার যুদ্ধ অওধ সুবার ভাগ্যাকাশে ঘনিয়েছিল অন্ধকার। বক্সার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অওধের পায়ে পড়ল পরাধীনতার লৌহ শিকল। এখন থেকে অওধের নবাবদের ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মর্জি মতই চলতে হবে। অওধের এমন দুরাবস্থায় মারা গেলেন যোগ্য ও বিচক্ষণ নবাব সুজা-উদ-দৌলা।

১৭৭৫ সালের জানুয়ারীতে অওধের মসনদে বসলেন সুজা উদ দৌলার ২৬ বছরের পুত্র মোহাম্মাদ ইয়াহিয়া মির্জা আমানি আসফ-উদ-দৌলা। নতুন নবাব ছিলেন যোগ্য পিতার এক অযোগ্য পুত্র। তিনি ছিলেন খেয়ালী, বিলাসী ও খোশ মেজাজের মানুষ। সিংহাসনে বসেই আসফ-উদ-দৌলা পিতার রেখে যাওয়া ২০ লক্ষ পাউণ্ড স্টারলিং উত্তরাধিকার সূত্রে তার মা বহু বেগমের কাছে দাবি করলে তিনি সেই অর্থের কিছু অংশ পুত্রকে দিতে চাইলেন। কিন্তু এতে তরুণ নবাব মায়ের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে রাজধানী ফৈজাদাবাদ ত্যাগ করে লক্ষৌ চলে এলেন।

সেই শুরু অওধের রাজধানী ফৈজাবাদের গৌরবহানির। এদিকে নবাব আসফ উদ দৌলা মসনদে বসেই রাজধানী পরিবর্তন করার নেশায় মেতে উঠলেন। কিন্তু পরিবারের বাকিদের এতে কোন মত ছিল না। অনেকে নবাবকে বলতে শুরু করেছিল 'সুজা-উদ-দৌলার নালায়েক বেটা' কারণ তিনি তার পিতার সাজানো রাজধানী ফৈজাবাদকে উপেক্ষা করে লখনৌকে রাজধানী করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। কারণ আসফ-উদ-দৌলা কোনদিনই ফৈজাবাদকে পছন্দ করতে পারেননি। ১৭৭৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী পিতা সুজা-উদ-দৌলাকে সমাধীস্থ করার সময় নবাব তার পিতার মৃতদেহের সামনে গিয়ে তিনি বলেছিলেন '*বু এ বফা নমি আয়দ পিদর এ মহতরম*' যার অর্থ *হে পিতা, আপনি যে মাটিতে সমাধিস্থ হতে চলেছেন সেখানে ভরসা ও বিশ্বাসের কোন গন্ধ নেই।* ফলে বিরোধিতা সত্ত্বেও একদিন হঠাৎ করে লক্ষৌকেই নবাব অওধের রাজধানী ঘোষণা করে দিলেন।

এদিকে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজ কোম্পানী অওধের দরবারে খবরদারী করার এক অলিখিত অধিকার পেয়ে যায়। ইংরেজরা নবাব আসফ-উদ- দৌলা কে বোঝায় যে এত বিশাল সৈন্যবাহিনী রেখে কি হবে? কোম্পানীর সৈন্য তো আছেই অওধকে রক্ষা করার জন্য। এ কথায় তরুণ নবাব সেদিন খুশিই হয়েছিলেন। তার নিজেরও ফৌজের খুব একটা শখ ছিল না। অন্যদিকে বিলাসীতার জন্যও প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের তাই আসফ-উদ-দৌলা নিজের জন্য অল্প কিছু খাস সৈন্য রেখে পুরো সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিলেন। নবাব ভাবলেন এতদিন সৈন্যদের বেতন বাবদ যে বিপুল অর্থ খরচ হত এখন থেকে তিনি তা বিলাসীতায় ব্যয় করতে পারবেন।

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

বর্ধমান জেলার কয়েকটি পথের কথা

রাতুল দে



বর্ধমানের ইতিহাস খুব পুরনো। কতটা পুরনো হিসেব করতে গেলে গণ্ডগোল হয়ে যায়। গণ্ডগোল অবশ্য হয়েই বসে আছে। তাই আজ পর্যন্ত হিসেব করে ওঠা গেলো না। 'বর্ধমান' নামটি কেমন করে এলো। নানা মুনির নানা মতে আমরা বিভ্রান্ত। কেউ বলেন 'মহাবীর বর্ধমানের' নাম অনুসারে 'বর্ধমান' নামকরণ হয়েছে। জৈন আচারাঙ্গ সূত্র অনুযায়ী মহাবীর রাঢ় দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং এই অঞ্চলের মানুষ উলঙ্গ সাধুকে দেখে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলেন। অনেকে বলেন সেই থেকেই এই অঞ্চলের নাম বর্ধমান হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আচারাঙ্গ সূত্রেই পাওয়া যায় মহাবীর 'বর্ধমান পুরম অঞ্চলের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিলেন, এ থেকেই প্রমাণিত হয় মহাবীর রাঢ় দেশে ভ্রমণ করার আগেই এই অঞ্চলের নাম 'বর্ধমান' ছিল। ড. পঞ্চানন মণ্ডল বলছেন, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অস্ট্রিক বীর যাযাবর বড়ো (বাউরি), ডোমন (ডোম) ইত্যাদি জাতির লোকেরা এই অঞ্চলে বসবাস করত। এদের জাতিগত নাম থেকেই 'বোড়ো' + 'ডোমন' মিলিতভাবে 'ব্রডমন' নামকরণ হয়েছে। গ্রিক ঐতিহাসিক জাস্টিন, প্লুটার্ক প্রমুখ এই অঞ্চলের নাম 'ব্রডমন' বলে উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ আমলে BRODMON ইংরেজদের BURDWAN উচ্চারণ হয়েছে। যদিও বর্তমানে BARDHAMAN কথাটি চালু আছে।

খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে (১০৬৩-৮১) সোমদেব রচিত 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থে বাংলার পুণ্ড্রবর্ধন নগর, পৌণ্ড্র দেশ এবং বর্ধমান তাম্রলিপ্তের নাম বহুবার উল্লেখিত হয়েছে। এই নগরীগুলিকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী, সমৃদ্ধ ও সজ্জন ব্যক্তিগণের আবাস্থান বলা হয়েছে। 'কথাসরিৎসাগর' থেকেই জানা যায় বর্ধমান শহরে পরোপকারিন নামে এক রাজা বাস করতেন। তাঁর কন্যার পণ ছিল, সে ব্যক্তি সুবর্ণ নগরী দেখেছে তাহাকেই সে পতিত্বে বরণ করবে। রাজকন্যাকে লাভ করার লোভে শক্তি বেগ নামে এক ব্রাহ্মণ বিন্ধ্যারণ্যে যান, সেই স্থান থেকে কাম্পন্যে যান। এখান থেকে তিনি সমুদ্রতীরে আসেন এবং এক বণিকের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করেন। বর্ধমান থেকে এক চিত্রকর কলিঙ্গ দেশে গিয়ে সেখানকার রাজকন্যার একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেন। পাটলিপুত্রবাসী এক ব্রাহ্মণ বর্ধমানে এসে সেখানকার এক তরুণীর পাণিগ্রহণ করেন, তারপর বধূকে পাটলিপুত্রে নিয়ে যান। গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে ক্ষেমেন্দ্র রচিত 'বৃহৎ কথামঞ্জরী' গ্রন্থে বিদূষক নামে এক ব্রাহ্মণের অবন্তী থেকে পুণ্ড্রবর্ধন আগমন বর্ণিত হয়েছে।

(ক্রমশ)

৩ পৃষ্ঠার পর

আসফ-উদ-দৌলা : অওধের এক খেয়ালী নবাব

হলোও তাই, রাজধানী লক্ষ্ণৌ সেজে উঠল নানান চোখ ধাঁধানো স্থাপত্যে। দরবারের জাঁকজমকও অনেক বেড়ে গেল। বিলাস ও ভোগে মেতে উঠল সমগ্র লক্ষ্ণৌ শহর। লক্ষ্ণৌর উন্নতি ও সৌন্দর্য এমনই বৃদ্ধি পেল যে লক্ষ্ণৌর কাছে হিন্দুস্থানের সব শহরের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে গেল।

এদিকে নবাব আসফ-উদ-দৌলা মেতে উঠলেন নাচ, গান, খানাপিনা, শায়রী মুশায়রা, মুর্গবাজী, বটেরবাজী, কবুতর বাজী ও স্থাপত্য নির্মাণে। লক্ষ্ণৌ পরিণত হল তৎকালীন ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিক কেন্দ্রে। নতুন শহরের জাঁকজমকতার খোঁজ পেয়ে পুরানো রাজধানী ফৈজাবাদ থেকে সব আমীর ওমরাহরা সব বহু সাধারণ মানুষ লক্ষ্ণৌতে পাড়ী জমালে সেখানে গড়ে উঠল নতুন নতুন বসতি। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে দিল্লীর গৌরব ম্লান হয়ে আসে। অন্যদিকে ঠিক একই সময় অওধ সুবা সমৃদ্ধ হয় এবং দিল্লীর স্থান দখল করে। দিল্লী থেকে বহু কবি চিত্রকর, বাদক, গায়ক, নতকীরা এসে ভিড় জমাতে থাকে আসফ-উদ-দৌলার রাজ্যে।

নবাব আসফ-উদ-দৌলা ছিলেন একজন 'দিল-দরিয়া' মানুষ। তিনি নিজে যেমন বিলাসিতায় গা ডুবিয়ে রাখতেন তেমনি তার প্রজাদের দুঃখ কষ্টেও তাদের পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। নবাবের এই উদারতার জন্যই প্রজাদের কাছে তিনি মহৎ এবং প্রিয় নবাব হয়ে উঠেছিলেন। নবাবের এই দানশীলতার জন্যই তার অন্যান্য দোষ ত্রুটিগুলিও ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

১৭৮৪ সালে অওধে ভীষণ খরা দেখা দিলে শুরু হয় দুর্ভিক্ষ। এতে বহু মানুষ মারা যেতে থাকল খেতে না পেয়ে। তাই সকল প্রজা একজোট হয়ে তাদের প্রিয় নবাবের কাছে অনুরোধ করে যে নবাব যেন তাদের এই দুর্দশা থেকে মুক্ত করে সবার জন্য দুবেলা খাদ্যের সংস্থান করে দেয়। দয়ালু নবাব প্রজাদের আর্জিতে সম্মত হলেন। এবং সেই সাথে তিনি একটি শর্তও রাখলেন। নবাব ঘোষণা করলেন তাঁর সমস্ত প্রজাকেই নবাব দুবেলা পেটপুরে শাহী খাবার খাওয়াবেন তিনি, কিন্তু তার বিনিময়ে তাদের ইমামবাড়া নির্মাণের দায়িত্ব নিতে হবে, দিতে হবে শ্রম। যাতে করে একদিকে যেমন নবাবের ইমামবাড়া নির্মিত হবে তেমনি অন্যদিকে প্রজাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হবে।

এই অসহায় জনসাধারণের মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষও ছিল যারা দিনের বেলায় ইমামবাড়া নির্মাণে অংশ নিতে ইতস্তত করত। তাই ইমামবাড়ার নির্মাণ কাজে তারা রাত্রিবেলায় অংশগ্রহণ করত। রাত্রিতে মশালের আলোতে এই নির্মাণ কাজ পরিচালিত হত। এইভাবেই একদিন বিখ্যাত নির্মাণ শিল্পী কিফায়ত উল্লাহর তত্ত্বাবধানে এবং প্রায় ২০ হাজার প্রজাদের পরিশ্রমে নবাব আসফ-উদ-দৌলার স্বপ্নের এই ১৬৭ ফুট লম্বা ও ৫৩ ফুট চওড়া ইমারত নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়। এছাড়াও খেয়ালি নবাব বহু মনোরম স্থাপত্য নির্মাণ করেন। নবাব নিজের জন্য নির্মাণ করেন 'দৌলতখানা প্রাসাদ' এছাড়া রুমী দরওয়াজা, বিবিয়াপুর কোঠি, চুনহাট কোঠি ইত্যাদি। বিবিয়াপুর কোঠি ছিল নবাবের আসফ-উদ-দৌলার বাগান বাড়ী। এখানে নিরিবিলি শান্ত পরিবেশে নবাব অবসর যাপন করতে ভালোবাসতেন।

এইসব চকমপ্রদ স্থাপত্য নির্মাণ করে লক্ষৌ নগরীকে সাজাতেই নবাবের বহু অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। এছাড়াও নবাবের ছিল নানা শখ আহ্লাদ, নবাব মুর্গবাজীতে আগ্রহ রাখতেন, এতেও তিনি দেদার অর্থ বিলোতেন। সেই ইংরেজদের নানান সময়ে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন যা কখনই তিনি আর ফিরে পেতেন না।

নবাব আসফ-উদ-দৌলা নিজে একজন বড় কবি ছিলেন। তাই তিনি কবিদের কদর বুঝতেন। কাব্য চর্চাতেও তিনি দুহাত উপুড় করে অর্থ বিলিয়েছেন। তিনি এমনি উদারহস্ত ছিলেন যে বহু কবিদের তিনি মাসিক ভাতার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। নবাবের উদারতার আর এক পরিচয় মেলে একটি ঘটনায়। একবার নবাব আসফ-উদ-দৌলার দরবারে এক নবাগত বাবুর্চীকে হাজির করা হলে নবাব জানতে চান যে সে কি রান্না করতে পারে। একথার উত্তরে সে জানায় 'হুজুর শুধু মাষকলাই এর ডাল রাধতে পারি'। মাইনের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে মাসিক ৫০০ টাকা নেবে। বেশি মাইনে সত্ত্বেও দরিয়া দিল নবাব তাকে কাজে নিযুক্ত করলেন। এদিকে বাবুর্চী কাজে যোগ দেবার আগেই তার নিজস্ব কিছু শর্ত নবাবকে শুনিয়ে দিলেন।

(ক্রমশ)

১ পৃষ্ঠার পর

পৃথিবীর তিনটি রহস্যময় প্রত্নকীর্তি

পলিনেশিয়ানরা এসে পৌছেছিল এই আগ্নেয়দ্বীপে, জনবসতি স্থাপন করেছিল। তারাই দ্বীপের নাম রাখে 'রাপা নুই'। তারাই আগ্নেয় পাথর খোদাই করে বানায় ঐ দৈত্যাকার মূর্তিগুলি। বহন করে আনে কোনো আশ্চর্য উপায়ে 'রানো রারাকু' নামক জলাভূমির চারিপাশে। বেশি কিছু মূর্তি বহনকালে আকস্মিক পতনের ফলে পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। সেগুলি আজও তেমনভাবেই পড়ে আছে। কিন্তু গত কয়েক দশকে ছত্রাক ও শৈবালের সহাবস্থান অর্থাৎ 'লাইকেন'-এর প্রভাবে মূর্তিগুলো দ্রুত কাঠিন্য হারাচ্ছে। পাথর ক্ষয়ে কাদা-কাদা আস্তরণ তৈরি হচ্ছে মূর্তির গায়ে। বাকি কাজটুকু করে দিচ্ছে সমুদ্রের জলরাশির একটানা ঝাপটা আর প্রচণ্ড আর্দ্রতা। চিলির ন্যাশনাল ফরেস্ট কর্পোরেশনের (CONAF) কর্তা তাহিরা এডমগুসের মতে, আর বড়োজোর একশো বছর। তারপর হারিয়ে যাবে এই মোয়াই। হারিয়ে যাবে বিরাট এক রহস্য, কেন তৈরি হয়েছিল মোয়াই? কি করেই বা দ্বীপের সাধারণ কৃষিজীবী মানুষ অমন বিরাটাকার ২৫০ টন ওজনের মূর্তিগুলো সেযুগে প্রযুক্তিগত সুবিধা ছাড়াই যত্র-তত্র বয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল? ঐ মোয়াইগুলো আদতে কী? দ্বীপের অতন্দ্র প্রহরী নাকি আরাধ্য দেবতা, নাকি নিছকই শিল্পকর্ম?

(ক্রমশ)

২ পৃষ্ঠার পর

রেশম কথা

মালদহ জেলার ইংলিশ বাজারের নামকরণ থেকে এই ঘনিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদেশের বাজারে রেশম বস্ত্রের চাহিদা কেমন ছিল সে সম্পর্কে রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি বলেছেন — "A dress under slight veil our women countinue to show their shape to the public" ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প মানে ও গুণে অনেক বেশী এগিয়েছিল এর প্রমাণ আমরা পাই মুর্শিদাবাদ ব্যবসায়ী নথি থেকে। রেশম ব্যবসার খুঁটিনাটি ও ভবিষ্যতে জানতে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা তাদের দুই প্রতিনিধি হিউজেস ও পার্কারকে মুখসুদাবাদে পাঠান।

ভারতের অন্যান্য যে সব জায়গায় রেশম বস্ত্র উৎপাদন হত সেগুলোকে বাদ দিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রতিনিধি পাঠানো এই শিল্পের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠত্যেরই পরিচয়। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ জনৈক কুঠিয়ালকে ইংল্যাণ্ড থেকে কাশিমবাজারে প্রেরণ করেছিলেন পাশ্চাত্য দেশের প্রস্তুতকৃত রেশমের বাজার সৃষ্টি করার জন্য। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হ্যাল ওয়েটেনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে তৎকালে ছয় প্রকারের রেশম কাপড় এবং কাঁচা রেশম বর্তমানে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নাটোর থেকে ইউরোপ, বার্মা, পেগু, জেড্ডা, এডেন প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়েছিল।

সতেরো শতকের মধ্যভাগে ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোঘল সরকারের কাছ থেকে বাংলায় কয়েকটি রেশম কারখানা খোলার অনুমতি পায়। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কাশিমবাজারে রেশম কারখানা স্থাপন করে। প্রাথমিকভাবে বাণিজ্যের গতি মাঝারি রকমের থাকলেও ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার সাথে বিলাস দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং প্রচুর পরিমাণে থান কাপন ব্রিটেনে রপ্তানি হয়। এদের সাথে সপ্তদশ শতাব্দীতে পতুর্গীজ, ডাচ ও বণিকদের অংশগ্রহণে জেলাঞ্চলের রেশম শিল্প উৎপাদনের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে।

(ক্রমশ)

প্রধান সম্পাদিকা ও প্রকাশক - সহেলী চক্রবর্তী (৮৯৪২৯২৪২৩৪), প্রত্নচিহ্ন হইতে প্রকাশিত।
উপদেষ্টামণ্ডলী - ড. অধ্যাপক রাজর্ষী চক্রবর্তী, ড. স্বপন ঠাকুর, সুবিদ আবদুল্লা, ফারুক আবদুল্লা। অক্ষর বিন্যাস - শুভ্রজ্যোতি তালুকদার (৯৭৩৪৩১৪৫৬৮)